প্রমীলা
স্মৃতিকথা সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা

বিজিত ঘোষ

চতুর্থ খণ্ড

সেকালে বিখ্যাত, একালে বিস্মৃত
৫ জন লেখিকার ৫টি স্মৃতিকথা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

প্রমীলা-কথা	ড. বিজিত ঘোষ	১১
জীবনস্মৃতি	সুদক্ষিণা সেন	৪১
আমার সংসার	শরৎকুমারী দেব	১৪৩
আমার খাতা	ইন্দিরা দেবী	১৭১
আমার অতীত জীবন	মানকুমারী বসু	২২১
জীবনকথা	লীলাবতী মিত্র	২৩৭

প্রমীলা-কথা

সুদক্ষিণা সেন (১৮৫৯-১৯৩৪)

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরের সোহাগদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সুদক্ষিণা সেন। তাঁর পিতা জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। যদিও তিনি কৌলিন্য প্রথা নয়, জোর দিয়েছিলেন সন্তানদের শিক্ষার দিকে। তবে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। কৌলিন্য প্রথার অত্যাচারে সুদক্ষিণার পৈত্রিক নিবাস মাইজপাড়া হলেও সুদক্ষিণা বাস করতেন তাঁর মাতুলালয়ে। সুদক্ষিণার মা সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন ব্রাহ্মসমাজে।

সুদক্ষিণার মায়ের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার কারণ ছিল মূলত চারটি। প্রথমত, হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা; দ্বিতীয়ত, তাঁর পুত্রের অপরিণত বয়সে জোর করে দেওরদের বিবাহে বাধ্য করা; তৃতীয়ত, কন্যাদের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছা এবং অল্প বয়সে বিয়ে না দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং চতুর্থত, পৌত্তলিকতার প্রতি অনাস্থা।

মেয়েদের বিবাহও দেন তিনি বৈদ্য ও কায়স্থ পাত্রের সঙ্গে। সুদক্ষিণার স্বামী শিক্ষানুরাগী অম্বিকাচরণ সেন ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সুদক্ষিণার লেখা থেকে বোঝা যায় তিনি সুদক্ষিণার পরিবারের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত ছিলেন এবং তিনি বিয়ের আগে সুদক্ষিণাদের বাড়িতে রাত্রিবাস ও যাতায়াত করেছিলেন। সুদক্ষিণাদের বাড়িতেই তাঁদের বিবাহ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। তৎকালীন হিন্দুসমাজের প্রথা-পদ্ধতির চেয়ে এ সমস্ত কিছুই ছিল ঘোরতর বৈপরীত্যের পরিচয়বহ।

অম্বিকাচরণ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুদক্ষিণা-অম্বিকাচরণের একমাত্র কন্যার নাম সরযূ। সুদক্ষিণার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' শুধুমাত্র তাঁর কথাই নয়, তাঁর মায়ের কথাও। যাঁর দুঃসাহসিক কাজ সে সময় অনেক মায়েদের মনে আশা সঞ্চার করেছিল। গবেষক শ্রয়না সেন তাঁর একটি তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান প্রবন্ধে ('আত্মকথার অন্তরালে/নারী ভাবনার ক্রমবিবর্তন', 'বলাকা' সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, ডিসেম্বর, ২০১১) লিখেছেন ঃ '...সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিয়মের ক্ষয়িষ্ণুতা ও ব্রাহ্ম সমাজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির স্বরূপটিও তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দু ধর্মের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মসমাজে আসা আরও দুটি মেয়ের কথাও রয়েছে এই গ্রন্থে'।

সুদক্ষিণা সেনের এই অনন্যসাধারণ আত্মজীবনীটি আসলে দুই সমাজের মধ্যে এক যোগসূত্র বিশেষ। সমাজের সেই পালাবদল নারীদের জাগরণে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সেকালে, ইতিহাসই তার সাক্ষী। সেই সময়টা জীবন্ত রূপ পেয়েছে সুদক্ষিণার 'জীবনস্মৃতি'-তে।

সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে)। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল : ''স্বর্গগতা জনক-জননীর চরণে—আমার ''জীবনস্মৃতি'' উৎসর্গীকৃত হইল। প্রণতা শ্রী সুদক্ষিণা সেন। ভবানীপুর, ২৪ মাঘ, ৩৯ সন''। আখ্যাপত্রে প্রকাশকের ঠিকানায় ছিল :ঃ ''৫৭ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা হইতে দক্ষিণা সেন কর্তৃক প্রকাশিত''। মুদ্রকের

ঠিকানায় ছিল : ''শ্রী নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি বি-এ কর্তৃক আর্ট প্রেস ২০ নং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট হইতে মুদ্রিত''। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০২।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয় সুদক্ষিণা সেনের।

'স্কুল অব উইমেন্‌স স্টাডিজ' (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-এর বিশেষ সহায়তায় এবং 'দে'জ পাবলিশিং' (কলকাতা ৭০০ ০৭৩)-এর প্রকাশনায় ''সুদক্ষিণা সেন/জীবন স্মৃতি'' গ্রন্থে (সম্পাদনায় সহায়তা/অভিজিৎ সেন অনিন্দিতা ভাদুড়ি), একটি অসামান্য মূল্যবান 'ভূমিকা'য় অধ্যাপিকা সুতপা ভট্টাচার্য আমাদের জানিয়েছেন: 'ব্রাহ্ম সমাজের কর্মসূচিতে নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। সেসব কারণেও হয়তো অচেতন মেয়েরা ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু, পুরুষদের মতোই নিছক আধ্যাত্মিক চেতনার তাগিদেই কি মেয়েরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবেন নি কখনো?

ভেবেছিলেন যে, তারই পরিচয় আছে সুদক্ষিণা সেনের জীবনস্মৃতিতে। তাঁর নিজের এবং তাঁর মায়ের, দুজনেরই পুরুষানুক্রমিক পৌত্তলিক ধর্ম-সংস্কারের বাইরে নিজস্ব বোধের উন্মেষের কথা জানিয়েছেন সুদক্ষিণা। সেই বোধ নিয়ে তাঁরা নিজের ঘরের নিরাপদ কোণটিতে বসে থাকেন নি। সুদক্ষিণার মা নিত্যকালী দেবী তিনটি সন্তান নিয়ে নিজের গ্রামের নিজের পরিবারের স্নেহসজল আশ্রয় ছেড়ে, নিরাপত্তার যাবতীয় ভাবনা ছেড়ে, সুদূর কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মবোধের তাগিদেই মুখ্যত। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর গৌণ কারণটিও অবশ্য ছিল। উনিশ শতকের বাঙালি মেয়ের ইতিহাসে মেয়েদের এমন একটি সামর্থ্যের দিক অনুল্লেখিতই থেকে যায় সচরাচর ঐতিহাসিকের কলমে। সুদক্ষিণা সেনের জীবনস্মৃতি সে সামর্থ্যের সাক্ষ্য রচনা করেছে। বাঙালি মেয়ের ইতিহাসে তাই এ বইটির গুরুত্ব অসীম। শুধু তাঁর নিজের পরিবারের কথাই নয়, এ বই থেকে বিধুমুখী দেবীর মতো আরো কোনো কোনো মহিলার কথা জানতে পারছি, স্ব-ইচ্ছায় যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ....কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে সুদক্ষিণারা কীভাবে ব্রাহ্মসমাজে এলেন, সেই সময়কার ব্রাহ্মদের অবস্থা কেমন ছিল—সেসব বলার জন্যেই যে সুদক্ষিণার জীবনস্মৃতি লিখতে বসা, ভূমিকায় তিনি তা জানিয়েছেন। স্বভাবতই ধর্মপ্রসঙ্গ তাঁর বইতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে তাঁর এবং তাঁর মায়ের মনে ধর্মবোধের অঙ্কুর জাগল, দেখিয়েছেন তার মেয়েলি ধরণ। তাঁর মা যখন 'সনাতন সত্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট' হলেন, যখন তিনি লুকিয়ে 'ব্রহ্মোপাসনা' করতে আরম্ভ করলেন, তখন কিন্তু 'প্রকাশ্যে শিবপূজা' ছাড়তে পারেন নি। তাঁর বাল্যবয়সের ব্রতপালনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সুদক্ষিণা। ব্রত করতে করতেই তিনি তাঁর অর্থহীনতা বুঝতে পারেন, বুঝতে পারেন ভিতরের বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে এসব 'মিথ্যা অভিনয়' মাত্র, এবং প্রতিজ্ঞা করেন—আর ব্রত করবেন না। মেয়েদের সে-সময়কার সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বালিকার এই ছোট্ট বিদ্রোহ নেহাত ছোটো নয়। পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে সেখানকার উপাসনার অভিজ্ঞতা কী আবেগ দিয়েই না লিখেছেন সুদক্ষিণা : 'হে ঈশ্বর! সকল কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া, সকল মাটির কল্পিত পুতুল দেবতাগুলি চুরমার করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া তোমার নিরাকার রূপে মুগ্ধ করিতে এ তুমি কোথায় আনিলে?' প্রতি রবিবার তো ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা হতই, কেশব সেন সেখানে উপদেশ দিতেন। ভারতাশ্রমে দিনে দুবার উপাসনা হত। একবার সমস্ত রাত্রি উপাসনা হয়েছিল। সুদক্ষিণার ধর্মবোধ এসবের থেকেই জলসিঞ্চন পেতে থাকে। সুদক্ষিণা যখন ঢাকা থেকে কলকাতা আসেন দ্বিতীয়বার, লেখাপড়া শেখার জন্যেই, তখন

ভারতাশ্রমকে তাঁর থাকার জায়গা হিসেবে তিনি নিজেই নির্বাচন করেন। তাঁর ধর্মবোধই তার কারণ। তখনকার 'ব্রাহ্মদের আননে' তিনি 'স্বর্গীয় বিভা' দেখতে পেতেন। সুদক্ষিণা উপলব্ধি করেছিলেন, শুধু ধর্মবোধের কারণেই কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে সেই ব্রাহ্ম যুবকদের। এক তো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা মানে 'পিতামাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করা'। অন্যদিকে যে ত্যক্ত হচ্ছে তারও দুঃখ কম নয়। আবার স্ত্রীদের যতদিন নিজের কাছে আনতে না পারছেন, ততদিন তাদের সঙ্গেও দেখা করা মানা। পরিবারের সকলকে ত্যাগ করে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজে আসতেন, তাঁরা সে সমাজের সকল মানুষকেই আপন করে নিতেন। তাঁর ধর্মবোধ থেকে এই এক নতুন রকম আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছিলেন সুদক্ষিণা। সেই আত্মীয়তার, পারস্পরিক ভালোবাসার ছবি সবিস্তারেই বলেছেন তিনি, বলেছেন তার আনন্দের কথা। সেই আনন্দই তাঁর জীবনস্মৃতির মূল সুর। তবু, বিবাহ হওয়ার ফলে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি বলে সুদক্ষিণার আক্ষেপও কম ছিল না। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করাও তো নিত্যকালীর সংসার ত্যাগের লক্ষ্য ছিল। তাঁর স্বামী মৃত্যুর আগে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কথা বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন নিত্যকালীকে। নিত্যকালীর পিতৃগৃহের পরিবেশও এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল তাঁকে। সুদক্ষিণার শিক্ষালাভের বিবরণ সূত্রে উনিশ শতকের নারীশিক্ষার গোটা পরিস্থিতিরই একটা ছবি উঠে এসেছে এ বইতে।কোনো কোনো অবস্থাপন্ন পরিবার নিজেদের বাড়িতেই স্কুল বসাতেন, বড়ো বড়ো পদস্থ ব্যক্তিরা কখনো-সখনো আসতেন পরিদর্শনে, মেয়েদের পারিতোষিক দিতেন। এ ব্যবস্থা তখন পূর্ববঙ্গের অনেক পরিবারেই ছিল। সুদক্ষিণা কলকাতায় আসার পর দেখছি তিনি কেশব সেনের নারীবিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বেথুন স্কুলে না গিয়ে। বেথুন স্কুলের মেমসাহেব এসে তাঁর মাকেই ছাত্রী করে নেন, যদিও তিন দিনের বেশি তাঁর আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। খরচ কমানোর জন্যে নিত্যকালী কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন, ঢাকাতেও তখন 'এডাল্ট ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদক্ষিণা সেই বিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন তাঁদের আশ্রয়দাতা পরিবারে রান্না করে সকলকে পরিবেশন করে। অনেক সময় নিজে খেতে সময়টুকুও পেতেন না। ...যে সমাজে সুদক্ষিণা জন্ম নিয়েছেন (১৮৫৯), সেই হিন্দুসমাজকে তিনি 'কারাগারে'র উপমায় উপমিত করেছেন। প্রথম বাঙালি আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী শ্বশুরবাড়িকে দেখেছিলেন কারাগারের উপমায়। উনিশ শতকের মেয়েদের লেখায় নিজেদের অবস্থানের উপমা হিসেবে, 'কারাগারে'র অনুরূপ 'পিঞ্জর' তো ঘুরেফিরেই এসেছে, সে পিঞ্জর কখনো অবরোধের, কখনো পিতৃতন্ত্রের। সে 'কারাগার' বা 'পিঞ্জর' থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা তাঁদের সামনে ছিল না। কিন্তু সুদক্ষিণার কাছে বিশেষ ধর্ম বা সমাজই কারাগার, সেই ধর্ম বা সমাজ ত্যাগ করলেই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মসমাজে আসা তাই সুদক্ষিণার কাছে 'অন্ধকার কারাগার হইতে মুক্ত বাতাসে' আসা। হিন্দুসমাজ কেন তাঁর কাছে কারাগার স্বরূপ, তার উত্তর রেখেছেন সুদক্ষিণা, দেখিয়েছেন হিন্দুসমাজের কুসংস্কার মেয়েদের কীভাবে পেষণ করে। এক তো লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে—এই এক বিচিত্র কুসংস্কার ছিল সে-যুগে, মেয়েদের বিদ্যালাভের প্রধান একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কুসংস্কার। তার ওপর বৈধব্যপালনের চূড়ান্ত নিষ্ঠুর সংস্কার। একাদশীর নির্জলা উপবাসবিধি কি ভয়ংকরভাবে অনড় ছিল তখন। ...হিন্দু সমাজের বিচিত্র বিধিনিষেধের চাপে এবং পারিবারিক অত্যাচারের চাপে পিষ্ট এক 'পার্বতীমাসী'র কথা লিখেছেন সুদক্ষিণা, যাঁর আড়াই বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং পাঁচ বছর বয়সে বৈধব্য ঘটে। এমন অর্থহীন বিবাহ সত্ত্বেও পার্বতীর পুনর্বিবাহের কথা

তো চিন্তা করাও পাপ, যদিও পার্বতীর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা দিব্যি নতুন বউ ঘরে আনেন, আর সৎমার অত্যাচারে পার্বতীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সে অত্যাচার থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে পার্বতী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে উন্মুখ হয়ে ওঠেন এবং ব্রাহ্ম পুরুষদের সহায়তায় গ্রাম-পরিবার ত্যাগ করতেও সক্ষম হন। নিতান্ত কম বয়সে বিধবা হওয়ায় যে হিন্দু মেয়েদের জীবন হতাশাচ্ছন্ন ছিল, তাদের আশার আলো জোগানোয় ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকার কথা আমরা সকলেই জানি। পার্বতীর উদ্ধারের কাহিনি তারই এক দৃষ্টান্ত। বোঝা যায়, কেন সুদক্ষিণার কাছে হিন্দুধর্ম বা সমাজ কারাগারের উপমা পেয়েছিল।

...তবু, সেই কারাগার-সদৃশ হিন্দুসমাজ যে অচল অনড় ছিল না, তারও পরিচয় এই স্মৃতিকথার মধ্যে রয়েছে। ছয়-সাত মাসের মেয়ে নিয়ে সুদক্ষিণা যখন মা-বোনের সঙ্গে তাঁর মাতুলালয়ে আসেন, তখন দিনের আলোয় কেউ তাঁদের 'বাড়িতে উঠাইতে সাহস পাইলেন না', 'সমাজ তাঁহাদিগকে অভিশাপ অঙ্গুলি তুলিয়া নিষেধ করিতেছিল'। কেননা একে তো সুদক্ষিণারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন, তার ওপর আবার দুই বোনেরই অসবর্ণ বিবাহ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মোটে দুবছর পর, সুদক্ষিণা যখন শিশুপুত্র কোলে আরো একবার মায়ের সঙ্গে মামারবাড়ি এলেন, তখন 'বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র বাটির সকলে ও প্রতিবাসীরা' তাঁদের 'আহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন'। সে-সময় বেশ দীর্ঘদিন তাঁরা থাকলেনও সেখানে। বিলাত যাওয়ায় তখন হিন্দুসমাজে 'অধর্ম' বলে বিবেচিত হত, কিন্তু সুদক্ষিণার স্বামী তখন বিলাতেই ছিলেন, সেখান থেকে সুদক্ষিণাকে চিঠিও পাঠাতেন—এসব নিয়েও সেই সোহাগদল গ্রামে কোনো কথাটিও ওঠে নি।

হয়তো সেই কারণেই, হিন্দু সমাজের কুসংস্কার 'কুজ্ঝটিকা' বা 'কারাগার'-তুল্য হলেও হিন্দুসমাজের সবকিছুই এই লেখিকা হীন চোখে দেখেন নি। তাঁর শৈশব-স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মাতুল পরিবারের লক্ষ্মীপূজার ছবি : 'লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিবস রাত্রিতে চন্দ্রালোকে যখন সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়িয়া সকলে আহার করিতে বসিল, সে কি সুন্দর দৃশ্য'! ব্রাহ্মসমাজে পুরো জীবন যুক্ত থেকেও জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে 'লক্ষ্মীপূজা সংক্রান্ত' তাঁর দেশের একটি সুন্দর নিয়মের কথা না লিখে থাকতে পারেন নি সুদক্ষিণা। লক্ষ্মীপূজার সময় প্রতি বাড়িতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত থাকত, যে বাড়িতে আসত তাকেই সেসব দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। সব বর্ণের মানুষদের মধ্যেই এ প্রথা চলিত ছিল। সুদক্ষিণাকে বলতে হয়েছে : 'নিয়মটি বড়োই চমৎকার। ইহাতে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সৌহার্দ্যের আদান প্রদান হইত'। ...জীবনের যে-কোনো অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতাকে এই নারী যেন তাঁর স্মৃতিলোক থেকে সরিয়ে রাখতেই চেয়েছেন। কয়েকটি মৃত্যুশোকের অভিঘাত ছাড়া অন্য কোনো কালো দিক তার অন্ধকার ছায়া ফেলে নি কোথাও। সচরাচর মহিলা রচিত স্মৃতিকথাতে সেই কালো দিকগুলিই বেশি প্রাধান্য পায়। সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী। ...স্মৃতিকথা মাত্রেই ঐতিহাসিক দলিল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনার দিক থেকে হয়তো এই বইটি বেশ বেশিরকম গুরুত্বপূর্ণ দলিলই। কিন্তু সেদিক থেকে বইটি ব্যতিক্রমী নয়। একটি ছোটো মেয়ের ছোটো ছোটো আনন্দ কুড়িয়ে নেবার ইতিহাস আছে এই বইতে, তার স্বাদ বড়ো দুর্লভ। গুরুজনদের অবাধ্য হয়ে ঝড়ে আম কুড়োতে যাওয়া কিংবা ভারতাশ্রমের বাগানে বসে কচি ভুট্টা পেড়ে খাওয়ার কথা, বৃহদাকার ডালিম কিংবা মুলোর কথা, আইসক্রিমকে গোরুর মাংস ভেবে না খাওয়া, রান্না করতে করতে পড়া শেখা—এসব তুচ্ছ কথাই অন্যত্র মেলে না, উচ্চকথা বলতে তো সবাই পারে...।'

শরৎকুমারী দেব (১৮৬২-১৯৪১)

শরৎকুমারী দেব জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের (মতান্তরে ১৮৬১) ২৭ আগস্ট। কলকাতার বাগবাজারে। তাঁর পিতা কালীনাথ বসু (১৮৪৭-১৮৮৫) ছিলেন ব্রাহ্ম ও কেশব-অনুরাগী। পিতামহ লোকনাথ বসু।

শরৎকুমারীর মাতা ছিলেন কলকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের মেয়ে। শরৎকুমারীর স্বামীর নাম সত্যপ্রিয় দেব। কোন্নগরের সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে শরৎকুমারীর বিবাহ হয় ১৫ বছর বয়সে।

সত্যপ্রিয়ের পিতা শিবচন্দ্র দেব। সত্যপ্রিয়ের পিতামহ ব্রজকিশোর দেব। শিবচন্দ্রের এক পুত্র ও ছয় কন্যা। সত্যপ্রিয়ের ছয় সহোদরার নাম : কৈলাস-কামিনী, মোক্ষদা সুন্দরী, বিনোদা দেবী, ক্ষিরোদা দেবী, ক্ষেমদা দেবী এবং রমা দেবী। শরৎকুমারীর শ্বশুরমশাই শিবচন্দ্র দেব ছিলেন উনিশ শতকের এক বর্ণময় বাঙালি। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল শিবচন্দ্রের; দু'জনেই ব্রাহ্মসমাজের নেতা।

'পদ্মাবতী দেবী' ছদ্মনামে তিনি কয়েকটি রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'শান্তিকানন' নামে একটি রূপক কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'ইস্টলীন' নামের ইংরেজি উপন্যাসের একটি অনুবাদও তিনি করেছিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'পরিচারিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তিনি লিখতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর 'আমার সংসার' নামে আত্মজীবনীমূলক পুস্তক লেখেন। এই বইটি ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

'শাশুড়ির আদর যত্ন পেয়েছিলেন **শরৎকুমারী**। কারণ তাঁর স্বামী সত্যপ্রিয় ছিলেন শিবচন্দ্র দেবের একমাত্র সন্তান। ছয় মেয়ের পরে, আঁতুড়ে দুই ছেলে মারা যাওয়ায় অনেক দেবতার দরজায় মাথা কুটে সত্যপ্রিয়র জন্ম হয়। সেকালে, শুধু সেকালে কেন একালেও মেয়ের চেয়ে ছেলের আদর বেশি। ছেলে হীরের টুকরো, মেয়ে মাটির ঢেলা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মতো আলোকপ্রাপ্ত বাড়িতেও ছেলের মায়ের আদর ছিল। জ্ঞানদানন্দিনী যখন দুই ছেলে নিয়ে প্রবাস থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁরও খুব আদর হল। 'বউ-এর ছেলে না হলে আর আদর হত না। বাঁজা বউদের আদর নেই'। ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই বিশাল পরিবারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী কতটা নিঃসঙ্গ, কতটা উপেক্ষিতা ছিলেন। যাক সে কথা, এ নিয়ে আরেক শরৎকুমারীও কম লেখেন নি। তিনি ছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী। ঠাকুরবাড়িতে তাঁকে সবাই ডাকতেন 'লাহোরিণী' বলে। তিনি 'শুভবিবাহ' উপন্যাসের এক জায়গায় ছেলে-মেয়ের তফাতটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন, এক বিয়ে বাড়ি। মা মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া তদারক করতে করতে বলে উঠলেন, 'ওলো সুহাসিনী, তুই যেন দই খাসনি, কোলে কচি'।

সুহাসিনী আপত্তি জানায়, 'কেন মা ওই দেখো নবদুর্গা খাচ্ছে, ওরও তো কোলে কচি'। মা বললেন, ওর যে মেয়েটা। মেয়ে নাড়িতে সব সয়; তোর যে খোকাটি—বেটা ছেলে, সুখী শরীর, সর্দি হবে যে'।

নিস্তারিণীও তো একথাই বলেছিলেন, 'আমরা তো সবাই সইতে পারি, ছেলেদের জন্যই কষ্ট'। আর কৈলাসবাসিনীর যখন এক বছরের ছেলে মারা যাবার পর মেয়ে হল তখন তাঁর শাশুড়ি একটুকুও খুশি না হয়ে ব্যাজার মুখে শুধু বলেছিলেন—'সোনা হারিয়ে কাঁচ পাইলাম'। এক মেয়ে হবার পর স্থিরসৌদামিনীর মায়ের সাত বছর ছেলে না হওয়ায় তাঁর ঠাকুরদা আবার ছেলের বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। কারণ 'সংসারের মধ্যে একমাত্র যে ছেলে রোজগারি